শি বা জী ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

রবীন্দ্রনাথের গান : একটি ব্যক্তিগত প্রতিবেদন

সূচনা

মার্চ ২০১২-য় গানের জগতে বিরল, বিরল কেন, অলৌকিক এক কাণ্ড ঘটল। সেটি ঘটল আবার কলকাতা শহরে। ওইদিন, 'বিহান মিউজিক' প্রকাশ করে রবীন্দ্রসংগীতের একটি সিডি—এবং, দশখানি গানের সে সংকলনের প্রতিকটি পঁচাশি বছর পার এক শিল্পীর গাওয়া। সচরাচর, গাইয়েদের প্রতি বিশেষ নির্দয় কালপুরুষ—স্রেফ বয়সের ওজর খাটিয়ে সময়দেব, কণ্ঠঐশ্বর্যে ফতুর, একেবারে কাঙাল করে ছাড়েন স্বরসাধকদের। এই করুণ অথচ প্রায় অনিবারণীয় ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে, মধ্য-আশি এক মহিলার গলায় সুরে-তালে নির্ভুল, মীড়-মুড়কিতে সুললিত, বাণীর যুক্তিতে যাচাই-করা লয়-সঠিক গান শোনা, অভিজ্ঞতা হিসেবে চমকপ্রদ বই-কি। গায়িকা : বিজয়া চৌধুরী (জন্ম. ১৯২৫)। গায়ন তাঁর কেবল সুরেলা স্নিগ্ধতায় সীমিত নয়; তাঁর চেহারাও তা-ই—শান্ত, শীলিত প্রজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট বিজয়ার চলনে-বলনে। বোধহয়, ওই আত্মপ্রতিষ্ঠার সামর্থ্যগুণেই '(তোমার) ভুবনজোড়া আসনখানি' গানটি বিজয়া চৌধুরীর গলায় এত খুলেছে—যে-গান, ১৯১৬ সালে, সিঙ্গাপুর ছেড়ে হংকং যাওয়ার পথে চীনসাগরের উদ্দাম ভয়াল টাইফুন-ঝড়ের কবলে-পড়া টলোমলো জাহাজের ডেকে, কাঠরার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে বেঁধেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১); লস্কর-নাবিকের হৈ-হল্লা, বৃষ্টি-বাতাসের আওয়াজ ছাপিয়ে, যে-গানের প্রান্তিক দু-চরণে, পঞ্চান্ন বছরের কবি, দুর্যোগের ওই পরিস্থিতিতে, কথা ও সুর একযোগে বানাতে-বানাতে গেয়ে উঠেছিলেন, 'তোমার করুণ শুভ উদার পাণি/আমার হৃদয়-মাঝে দিক্-না আনি।'[১]

১

ছেলেবেলা থেকে বিশেষত, ১৯৬১-তে দেশময় রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় থেকে, রবিগীতি শুনে আসছি, শুনেই চলেছি। হিন্দুস্থানী মার্গসংগীত, বাংলার লোকগান, কীর্তন, চার স্বসিদ্ধ রচকপ্রতিভা দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-নজরুল-এর কাব্যগীতি, বাংলা আধুনিক-এর খানিক-খানিক, বিশ শতকের সাতের দশক অব্দি প্রায় সমস্ত হিন্দি ছবির গীত্, (কিয়ৎপরিমাণ) পশ্চিমা ধ্রুপদী, আমার নিজস্ব গানের ভুবন জুড়ে আছে। তবু, কবুল না করে জো নেই, ব্যক্তিগত এ ফিরিস্তিতে 'রবীন্দ্রসংগীত'-ই প্রধান।

ছাড়া-ছাড়া, আলগা-ভাবে বিদিত 'রবিবাবুর গান', ওই গানেরই 'ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর (১৮৮২-১৯৩৫) কাছ থেকে ১৯২৯ সনে লাভ করে গাম্ভীর্যময় উপাধি 'রবীন্দ্রসংগীত'; উপাধিটি অবশ্য সাধারণ্যে চারাবার আগে বেশ ক-বর্ষ কাটে; ১ অগস্ট ১৯৩৬, বিজ্ঞপ্তি দেয় *বেতারজগৎ*, 'রবীন্দ্র-গীতজ্ঞ অনাদিকুমার দস্তিদার-এর পরিচালনায়', ৮ অগস্ট ১৯৩৬-এ, কলকাতা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত হবে, 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুষ্ঠান'; রেডিয়ো-দুনিয়ায় 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' শব্দের প্রথমাগমন-মুহূর্তটি কিন্তু আত্ম-লাঞ্ছনারও স্বাক্ষরবহ; কেননা, ওই শুভ মুহরতের সন্নিকট-বেলায়, ১ অগস্ট ১৯৩৬-এর বিজ্ঞপ্তিতেই, আক্ষেপ করে *বেতারজগৎ*, 'বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ যে নবজীবন দান করেছেন তার কথা অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন। এটা বাংলার পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। আমরা এখন থেকে মাঝে মাঝে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশেষ আসর জমিয়ে এর প্রতিকারে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। ...আশা করি এই ধরনের অনুষ্ঠান বেতারের শ্রোতাদের মনঃতুষ্টির সাধনে বিফল হবে না'।[২] অপর গণমাধ্যম, গ্রামাফোন রেকর্ড-এর বাজারে, ১৯৩৫-এ রবীন্দ্রসুরারোপিত গানের শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি-তে বারকয়েক 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' শব্দটি এলেও, (অন্তত) ১৯৪১ পর্যন্ত, রেকর্ডের লেবেলে বড়জোর 'রবীন্দ্র-গীতি' লেখা হতো।[৩]

১৯৩৬ থেকে ১৯৬০, ভালোই লম্বা পথ—বাংলা গানের সে ভ্রমণ-পর্বে, 'রাগপ্রধান'-নজরুলি এবং রায়চাঁদ বড়াল-পঙ্কজ মল্লিক-শচীন দেব বর্মণ-হিমাংশু দত্ত-অজয় ভট্টাচার্য-প্রণয় রায়-সুবোধ পুরকায়স্থ প্রমুখ নির্মিত 'আধুনিক' গানের সঙ্গে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে, যুঝতে-যুঝতে, এগোয় রবিগীতি; তার উচ্চকোটির মার্জিত আখ্যা 'রবীন্দ্রসংগীত'-এ আস্তে-আস্তে সঞ্চিত হয় আবেগের রস-রসদ। আর তারপরই, বিস্ফোরণ, প্রত্যাশা-ছাপানো প্লাবন। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থাকোণ—কী পশ্চিম

বাংলা, কী বরাক উপত্যকা, কী পুব বাংলা, সর্বত্র, ১৯৬১-তে, রবীন্দ্রশতবর্ষে, রবীন্দ্রগান পায় গভীর হতে গভীরে শেকড় ছড়াবার মতন উর্বর মানবজমিন; 'রবীন্দ্রসংগীত' খেতাবটি তার গায়ে একেবারে সেঁটে বসে। 'রবিবাবুর গান'-এর মান্যতা আজ এত নিদারুণ, এত নিষ্করুণ যে, রবীন্দ্রনাথের *চণ্ডালিকা* গদ্যনাট্য (১৯৩৩) ও *চণ্ডালিকা* নৃত্যনাট্য-এ (১৯৩৮) বুদ্ধপরিকর আনন্দ-র শ্রীচরণে নিবেদিত চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি-র সন্তাপভরা অভিবাদন, 'আমার সর্বনাশ, আমার সর্বস্ব তুমি', (প্রকৃতিতে বুভুক্ষু) বাংলা গানের তরফ হতে (আনন্দময়) রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।[৪]

১৯৬১ সনে আমার, অর্থাৎ, সাড়ে ছয় বছর বয়সী এক বালকের কানে, যে-ধারার কথাসুর বর্ষিত হয়, দিনে-দিনে অল্পে-অল্পে তার চমকরেশ মেলাবার বদলে আবেদনে গাঢ়তর হতে-হতে ছাড়িয়ে যায় আর-সবকে। ওই সনেই বেরোয়, একবাক্সে, ছ-টি ৭৮ আর পি এম-এ গ্রন্থিত, রবীন্দ্রনাথ-এর অন্তিম নাট্যনিবেদন : আগাগোড়া সুরে ঢালাই-মাজাই-করা *শ্যামা*। সন্তোষ সেনগুপ্ত-নির্দেশিত *শ্যামা*-র মারফতই আমার সঙ্গে প্রথম, সত্যিকারের (শ্রুতি-) আলাপ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর। জন্মোৎসবের ওই মরশুমে, (কিংবা তার স্বল্প পরে), কানে আসে সুচিত্রা মিত্র-এর গাওয়া অস্তিত্ব-কাঁপানো আর্জি :

তোমার কাছে এ বর মাগি,
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-সুচিত্রা মিত্র-নীলিমা সেন-এর সরণি ধরে পরের পর চলে আসেন রাজেশ্বরী দত্ত, ঋতু গুহ, মায়া সেন, পূর্বা দাম, গীতা ঘটক, রমা মণ্ডল, শর্মিলা রায় (পোমো), স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও আরো অনেকে। ক্রমশ বাড়ে পরিচয়ের পরিমাপ—কখনো দাগ-চটা, আওয়াজে ঘ্যাঁসঘেসে, বনেদি ৭৮ আর পি এম রেকর্ড জোগাড় করে, কখনো-বা ৪৫ ই পি বা ৩৩ লং প্লেয়িং-এ সে-সবের পুনর্মুদ্রণ-বাবদ, রবীন্দ্রসংগীতের গণস্বীকৃতির পূর্বযুগের বহু মহিলা-শিল্পীর গান সাতের দশকেই শুনে ফেলি। অবাক হয়ে যাই পেশকারির নতুনত্বে : আদৌ দাঁত-চাপা নয়, উচ্চারণে চেষ্টিত আভিজাত্যের ছাপ নেই, আনুষ্ঠানিকতার দেখনদারি নেই, অথচ, যেমন সুরসিক্ত, যেমন অলংকৃত, তেমনি উদাত্ত, বলিষ্ঠ, পুরাতন সে গায়নশৈলি। যাঁদের গানের শ্রবণ-অভিঘাত একেবারে অভিভূত করে দিয়েছিল আমায় তখন, তাঁদের ভেতর রয়েছেন : অমলা দাশ, সাহানা দেবী, কনক দাশ, অমিতা সেন

(খুকু), মালতী ঘোষাল, রেণুকা দাশগুপ্ত, সাবিত্রী কৃষ্ণণ এবং অতি-অবশ্যই, কানন দেবী। একদিন হয়তো অনেক কথাসুরই ভুলে যাব, কিন্তু, জন্মে ভুলবো না, অবিশ্বাস্য রকমের প্রলম্বিত রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল, ১৮ মাত্রার নবপঞ্চ-এ (২/৪/৪/৪/৪) বাঁধা—যে-তালে রবীন্দ্রনাথের মোটে একখানি গানই আছে[৫], মধ্যবয়সে ১৯০৯-এ রচা—'জননী, তোমার করুণ চরণখানি'-র কানন দেবী-কৃত দম-পারঙ্গম অনায়াস পরিবেশন। ফলত, বুঝতেই পারি না, কেন, স্বীয় ছন্দতালের হয়ে সওয়াল করা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'সংগীতের মুক্তি' (১৯১৭) উল্লেখ করে, রবীন্দ্র-উদ্ভাবিত ছয়টি তাল, নবপঞ্চ (২/৪/৪/৪/৪)-ঝম্পক (৩/২)-ষষ্ঠী (২/৪)-রূপক্‌ড়া (৩/২/৩)-নবতাল (৩/২/২/২)-একাদশী (৩/২/২/৪) থেকে নবতাল ও একাদশী-কে বেছে, সত্যজিৎ রায় তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা' (১৯৬৭) নিবন্ধে নির্বিকার নিদান দিয়েছিলেন, তালগুলি এতই 'অসাংগীতিক' যে সে-সবে নিবদ্ধ রচনা একেবারে অগেয়।[৬] কস্মিনকালে-ভোলা-অসাধ্য আমার গানের ফিরিস্তিতে আরও আছে, ('ছন্দের বিদ্রোহী চেহারা'[৭] সম্পন্ন, ঘনপিনবদ্ধ নবপঞ্চ-এ নয়, বরং, ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ, মসৃণ কাহারবা-য় সাজানো), শ্বাসের সহজ স্পন্দে গীত, অমিতা সেন-এর 'ওগো বধূ সুন্দরী'। কনক দাশ-কানন দেবী প্রমুখের পাশাপাশি রয়েছেন আমার অতি-প্রিয় কিন্তু কম রেকর্ড-করা বেশ কিছু মহিলা-শিল্পী। যথা : রমা মজুমদার, বীণা চৌধুরী, উমা বসু (হাসি), বিনতা রায়, সুপ্রভা সরকার, সতী দেবী, অরুন্ধতী দেবী, মেনকা ঠাকুর, অমিয়া ঠাকুর, সুধা মুখোপাধ্যায়, ইলা মিত্র (ঘোষ), প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, এমনকী, শান্তা আপ্তে, লতা মঙ্গেশকর। বহু-বহু গানের ভিতর, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়-এর, (ফের কাহারবা-র চতুর্মাত্রায় গঠিত), 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি' আমার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া দুষ্কর—১৯২৭-এর ফাল্গুনে রচা যে-গানে রবীন্দ্রনাথ যাচনা করেছিলেন, 'তৃষাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস' বয়ে-আনা 'আসন্ন বৈশাখী'-র কালবেলাতেও যেন নীরব না হয় বাঁশি, 'হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী'।

রেকর্ড-দুনিয়া ছিল; ছিল আবার রক্তমাংসে প্রত্যক্ষ মানুষী প্রতিবেশও। সকাল-বিকাল রবীন্দ্রনিন্দায় পঞ্চমুখ, বিচারঅন্ধ রবীন্দ্রবিদ্বিষ্ট আবহাওয়ায় বড়-হওয়া, আমার মুখরা মাসতুতো-মামাতো দিদিরা যখন বিশ শতকের সাতের দশকে সন্ধেবেলায় হারমোনিয়াম টেনে বসতো, তখন অনিবার্যতই ওলটাতো তারা *গীতবিতান*-এর পাতা। স্তব্ধবিস্ময়ে দেখতাম, প্রবল রবিবিরাগী দিদিরা কেমন, (উত্তর-গঠনবাদী সমালোচনা দেশের বিদ্যায়তনিক এলাকায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ঢের পূর্বে), অপরূপ সাবলীলতায়

পাঠকর্তা বা *অথর*-এর মৃত্যু বা অবলোপ ঘটিয়ে, পরের পর গেয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত। প্রত্যহের সে-সান্ধ্যবাসরে রবীন্দ্রনাথের গানে-গানে অকপটে বিজ্ঞাপিত 'আমি'-র মূর্ছনায় বিভোর দিদিকুল শোনাতো যেন তাদেরই নিষ্পিষ্ট, অনুদ্ঘাটিত, বাসনা-বিহ্বল জীবনগাথা—যেন-বা, 'এবার উজাড় করে লও হে আমার যা-কিছু সম্বল' কিংবা 'ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময়', বাণী যা-ই হোক, সমস্তই তাদের এক-অন্ত ব্যক্তিক উচ্চারণ। মামার বাড়িতে, পরিবারের কারো বিবাহ-উপলক্ষে জড়ো-হওয়া যুবক-যুবতীরা, খোলা ছাদে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে, একদা যে রবীন্দ্রসংগীতের উত্তাল স্বতঃস্ফূর্ত সভা বসিয়েছিল, আজও তা আমার স্মৃতিতে অম্লান—নিতান্ত নিরালা গান, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে/বসন্তের এই মাতাল সমীরণে', কোন্-এক জাদু-রসায়নে সেদিন, বড়দের দিঠি-এড়ানো ছিন্নশিকল গায়ক-গায়িকাদের আমুদে ঘটায়, সংগত বৃন্দগানে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

আটের দশকে প্রগাঢ় আলাপ হয় আমার বিভিন্ন গীতবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সুরৈশ্বর্যশালিনী মাধুরী মুখোপাধ্যায় ও তস্য গুণী কন্যা স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এত উত্তেজক, এত প্ররোচক ছিল তাঁদের সান্নিধ্য যে, যে-আমার গলায় স্বরমাত্রে একধার-সে কড়ি-কোমল মিলিয়ে বারো স্বরই জমায়েত হয়, অশ্রাব্য-অভোজ্য খিচুড়ি পাকায়, সে-ই আমিও তাঁদের রবীন্দ্র গানে অলজ্জ দোহারকি জোগাতাম।

নয়ের দশকে সাক্ষাৎ হয়, বোটানির প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বর্ষীয়ান নমিতা সাহার সঙ্গে। অত্যন্ত তালিমি কণ্ঠ; রবীন্দ্রনাথের হেন জটিল গান নেই যা তাঁর আয়ত্ত ছিল না; মীড়, স্পর্শস্বর, লয়, সূক্ষ্ম কোনো অঙ্গেই তাঁর তিলেক বিচ্যুতি হতো না—কিন্তু, গাইতেন তিনি ঘরের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে, অতিথিদের সাথে গল্পগুজবের ফাঁকে-ফোকরে; কখনও মনে হয়নি, তাঁর গায়নে পোশাকি কৃত্রিমতার সামান্যতম ছাপ আছে। (আমার দুই বন্ধু, গাইয়ে-বাজিয়ে, রেওয়াজি অরীন্দ্রজিৎ সাহা ও অপেশাদারি দক্ষতায় স্বয়ম্ভর গাইয়ে অমিত্রজিৎ সাহার মা) মাসিমা নমিতা সাহার 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে/যে কথা শুনায়েছি বারে বারে' অশ্রুত যে-সুরের সংকেত জাগত তার বর্ষণধার আজও অবিরত।

তবু, ঘনিষ্ঠ এত জানাজানি সত্ত্বেও, ২০১২-র আগে, বিজয়া চৌধুরীর রবীন্দ্রসংগীত আমার কানে পৌঁছোয়নি। না, গ্রামোফোন রেকর্ড নয়, সামনাসামনি শ্রবণ নয়, পৌঁছোল তা, হালের প্রযুক্তি, সারা আকাশ-পাতা, আপাত-বিশ্বের আন্তর্জাল, ইন্টারনেট-এর সৌজন্যে।

কথায়-কথায় জেনেছিলাম, আন্তর্জাল-সংসারে বঙ্গসংগীতের নানান যা ঘাঁটি আছে তাদের অনেক ক'টিতেই নোঙর বাঁধলে বিজয়া চৌধুরী নামক জনৈক গায়িকার ঘাটে পৌঁছোনো যায়। বিশুদ্ধ কৌতূহলবশে, এ-মুলুক সে-মুলুক ঢুঁড়ে, পেলাম অবশেষে আমার অন্বিষ্ট পারানির খোঁজ। শুনলাম : 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে'। প্রথম দফাতেই ধ্বনিস্রোতে মাত। এ গান কতবার, কত-না লোকের গলায় শুনেছি। আর, প্রায় প্রত্যেকবার, এমনকী, অপটু পরিবেশনের বেলাতেও, আচ্ছন্ন হয়েছি এর মাদকতায়। যেন কোন্ গোপ্য ইঙ্গিত আছে 'নীপ' শব্দে; এমন এক মিহিন উদ্বৃত্ত যা 'নীপ'-কে তার সমার্থশব্দ 'কদম'-এ তর্জমা করলে হারিয়ে যায় একেবারে। আবার, 'কদম' অর্থে 'নীপ'-র ধ্বন্যাঘাতে অনিবার্যত বাজে কৃষ্ণপালার রণন; 'এসো নীপবনে'-র আহ্বানে বৃন্দাবনী গোপিনীদের আভায় ঝলমলায় সিনানে আহূত বালাগণ। এই এখনকার ও সেই কবেকার, আলাদা এ দুই কালপটের জোড়মিতালি এত মোলায়েম, ১৯২৫-এ গাঁথা ৬৪ বৎসর বয়স্ক 'বৃদ্ধ' কবির এ গানে, যে তার ক্ষীণ আভাসটুকুই যথেষ্ট। ওই সংবৃতির কল্যাণেই, অসংবৃত হয় বাসনা, 'ধারাজল' যেন না থামে, আমন্ত্রিতদের 'ঘন কালো কেশ' যেন 'আকুলিয়া'ই থাকে। সে-বাসনায় ইন্ধন দিতেই বোধহয় এমন গড়ান সুরের যে (ধ্রুপদের চার তুক অনুযায়ী) আস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ-এর বৃত্ত পূর্ণ করে নিয়ম-মাফিক অস্থায়ী ছুঁয়ে গান ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াও কঠিন। পাগল করে মারে যে 'কারো স্নান'-এর অপরিশ্রান্ত রতিআবাহন—

বিজয়া চৌধুরী-র 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে' আমাকে আপাদমস্তক ভিজিয়ে পুরো ভাসিয়ে ছাড়ে—নিদেন দু-দিন সকালে-সাঁঝে ফিরে-ফিরে বারে-বারে বাজাই সেটি। গানটি রেকর্ড করেছিলেন বিজয়া ১৯৬৭ সনে। ২০১১-য় প্রকাশিত তাঁর প্রথম সি ডি 'ভুবনজোড়া আসনখানি'-র অন্তর্গত। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত বিজয়া চৌধুরী গীত ষোলোখানি গানের সংগ্রহ ওই সি ডি—শিরোনাম-সূচক 'ভুবনজোড়া আসনখানি' (১৯৭৮) ও 'এসো নীপবনে' (১৯৬৭) সমেত আছে তাতে, 'সন্ধ্যা হল গো' (১৯৬৫), 'ওগো শোন কে বাজায়' (১৯৭২), 'এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন' (১৯৭৭), 'তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ' (১৯৮০), 'তিমিরময় নিবিড় নিশা' (১৯৮০), 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' (১৯৮০), ইত্যাদি। বিজয়া চৌধুরী-র জোরালো স্বর-প্রক্ষেপণ বহুদূর স্মরণ করায় রবিগীতি-র গণপ্রসারের প্রহর-আগের গায়নরীতি। এমন নয় যে তাঁর গায়কিতে পরের পর্বের বেশ কিছু শিল্পীর ধরন-ধারণের প্রভাব নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে, নানা আঙ্গিকের 'মিশ্রণ'-ই বিজয়ার গীত-বৈশিষ্ট্য। কী ইতিহাস সে মিশ্রণের?

রাজধানী কলকাতা হতে, সব অর্থে, যোজন-যোজন তফাৎ, অল্প কিছুদিন শিলং, এবং পরে কৈশোর ও প্রথম যৌবনে, 'নির্বাসিতা শ্রীভূমি' সিলেট-এ জীবন কেটেছিল বিজয়ার। ঝরঝরে, স্বাদু গদ্যে লেখা, বিজয়া চৌধুরীর স্মৃতিলেখা *সিলেট কন্যার আত্মকথা* (২০০৪) ভরতি আছে এমন-সব তথ্য-খবরে, যা আধুনিক বাঙালির নির্মীয়মাণ গানের ভুবনটিকে চিনতে-বুঝতে সমাজ-বিজ্ঞানীর খুব কাজে আসে।

বিজয়া চৌধুরী, তখন নন্দী মজুমদার, জন্মেছিলেন সাংগীতিক আবহে—তাঁর সব ভাই-বোনেরা সহজাত মুনশিয়ানায় সুর সাধতেন, সকলেই গাইতে উপক্রম করেন 'প্রায় কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই'।[৮] *সিলেট কন্যার আত্মকথা*-য় প্রাপ্তব্য বিজয়ার নিজের এবং সাধারণভাবে সিলেটের সংগীতচর্চা সম্পর্কে সংবাদের কয়েকটি :[৯]

■ নন্দী মজুমদারদের বাসায় যখন-তখন গানের আসর বসতো। সেই ছেলেবেলায়, আসরের কর্ণধার অকালপ্রয়াত সেজদার চড়াগলায় শোনা 'কত কথা তারে ছিল বলিতে', 'ওগো মিতা সুদূরের মিতা'-র রণন-বেদন আজও উন্মন করে বিজয়াকে।

(এর মানে, ১৮৯৪-এ তৈরি 'কত কথা তারে ছিল বলিতে' নিয়ে বলা না গেলেও, ১৯৩৫-এ তৈরি 'কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি জান/ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা', টাটকা-টাটকাই সিলেট শহর-পানে রওয়ানা হয়। কী রহস্য ওই ক্ষিপ্র গমনের?)

■ উত্তর খুব সোজা। শহরে শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষক ছিলেন, ছিলেন খানিক-সানিক রবীন্দ্র-অতুল-দ্বিজেন্দ্র-নজরুল-এর রচনা-জানা কেউ-কেউ, ছিল বেতারে ক্বচিৎ-কখনো রবীন্দ্র-গীতের বৈঠক, কিন্তু, সেখানে গানের মুখ্য সম্প্রচারক ছিল গ্রামোফোন রেকর্ড। সাড়ে তিন মিনিটের ডিস্কে গায়ন-বাদন পুরে ফেলে সংরক্ষণের বিস্ময়কর বিশ শতকীয় প্রযুক্তি খুলে দিয়েছিল অভিজ্ঞতার নতুন এক দরজা গাইয়ে-বাজিয়ের ভৌতিক অথচ স্থায়ী, মায়াবী অথচ নিত্য উপস্থিতির জানান। ওই কুদরতের সাক্ষাৎ এক পরিণাম ওস্তাদি সংগীতের জগতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খেয়াল ও ছোটো-সে-ছোটো আলাপ-সহ গৎ বাজনার আবির্ভাব। নানা জাতের গীত্, বিশেষ ঠুংরি-ভজন, বিশেষ লাভবান হয়েছিল ওই সময়-সংক্ষেপে। আর যেহেতু, অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত, কোনো জোরাজুরি ছাড়া, আপনা হতেই তিন-সাড়ে তিন মিনিটের আয়তনে ফুরিয়ে যায়, তা-ই, ৭৮ আর পি এম-এর অতি-সীমিত বেড় তার পক্ষে খুবই খাপসই ছিল।

(আরও অন্যদের মতন), সুরপাগল নন্দী মজুমদার ভাই-বোনেদের 'সত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে' গিয়েছিল গ্রামোফোন।)

■ যৌবনপ্রারম্ভেই, গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে হারমোনিয়াম হয়ে বহু নারী-শিল্পীর গান বিজয়ার কণ্ঠে পাকা বসত গাড়ে। এঁদের মধ্যে আছেন : কনক দাশ, মালতী ঘোষাল, রেণুকা দাশগুপ্ত, কানন দেবী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং (বিজয়ার বিচারে, অনন্যা) উমা বসু (হাসি)। শিলং-সিলেটের জলসায়, ১৯৩৯-এ প্রণীত 'ওগো তুমি পঞ্চদশী'-র কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত পরিবেশনের 'হুবহু নকল' কতবার যে গেয়েছেন কলকাতা-শান্তিনিকেতন-বিহীন বিজয়া তার ইয়ত্তা নেই। শিলং-এ একবার, বিজয়ার এক অনুরাগিণী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-তনয় দিলীপকুমার রায়-এর সামনে বিজয়া-কে 'কিন্নর কণ্ঠ' উমা বসুর সহিত তুলনা করেন। বিজয়ার নিজের ভাষায়, 'গান গাইতাম তোতা পাখীর মত—যা শুনতাম আর যা ভাল লাগতো তাই গলায় তুলে নিতাম'। নিঃসন্দেহে, আহরণের এ সহজ ক্ষমতা, যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির এ দক্ষতাকে, পুষ্ট করেছিল গ্রামোফোন-এর কল।

(১৯৩৭ সালে বেরোয় প্রমথেশ বড়ুয়া নির্দেশিত ছায়াছবি *মুক্তি*। পঙ্কজ মল্লিকের উদ্যোগে বাংলা সবাক সিনেমায় প্রথম ব্যবহৃত হয় রবীন্দ্রনাথের গান। এদের সবকটি, যেমন, কানন দেবী-র 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে' [রচনা : ১৯১৯], লোকমধ্যে শীঘ্র ছড়িয়ে পড়ে। এই সঞ্চরণশীলতাকে জিইয়ে রাখে গ্রামোফোন। ১৯৩৭, এবং তৎপরও, ছায়াছবিতে প্রযুক্ত রবীন্দ্রসংগীত, আদৌ 'শুধু ফিল্মের সেলুলয়েডে আবদ্ধ [থাকে] না—অচিরে গ্রামোফোন কোম্পানি চলচ্চিত্রের কারণে জনাদৃত রবীন্দ্রগীতিগুলি ডিস্কে ভরে সারাদেশে চারিয়ে [দেয়]'।[১০])

■ বিজয়ার পাড়াতে ছিল বেশ কয়েক মণিপুরী ঘর। মণিপুরী উচ্চারণে বাংলা কীর্তন ওখানেই শোনেন বিজয়া। 'মাথুর পালা'য় কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণও হন উনি। সিলেটে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয়া প্রথম স্বাদ পান রাধারাণী দেবীর সুললিত কীর্তনের—তখনই তা ওঁর কর্ণ ভেদ করে মর্মে গিয়ে পশে।

■ 'গণনাট্য' আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান শ্রীহট্ট। সে-সুবাদে, চারের দশকে, মঞ্চে দেখেন বিজয়া বামভাবনাশ্রয়ী অভিনব কিছু নৃত্যনাট্য; পরিচিত হন, বাংলা গানের জগতে রবীন্দ্রোত্তর যুগের দুই কীর্তিমান পুরুষ, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলিল চৌধুরীর বাণী ও সুরের সঙ্গে।

■ ১৯৬৪ সনে, জীবনে প্রথম পাকাপাকিভাবে শুরু হয় বিজয়ার কলকাতা-বাস। এই সময়েই রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা নেন তিনি দেবব্রত বিশ্বাস ও সন্তোষ সেনগুপ্তের কাছে। এবং অবশেষে, ১৯৬৫-এ, বয়স যখন বিজয়ার চল্লিশ, চরিতার্থ হয় তাঁর বহুকালের সাধ—সন্তোষ সেনগুপ্তের সহায়তায় বেরোয় বিজয়া চৌধুরীর গ্রামোফোন রেকর্ড। তার একপিঠে, 'সন্ধ্যা হল গো', অন্যপিঠে, 'দুখের বেশে এসেছ ব'লে'।

ততদিনে অবশ্য আমূল পালটে গেছে রবিবাবুর গানের হাল-হকিকৎ। জোড়াসাঁকো-ব্রাহ্মসমাজ-শান্তিনিকেতনের আঙিনা টপকে যে-গান অনেক যুগ সামান্য ক-জনের বেষ্টনীতে আটকা, যে-গান (তথাকথিত) শিক্ষিতবর্গে মোটের ওপর 'মেয়েলি' তথা 'অশ্লীল' বলে ধিক্কৃত, যে-গান বহু আচ্ছা-সে-আচ্ছা সমঝদারের কানে 'গানই নয়', তা, (১৯৩৭-এর *মুক্তি* ও অন্যান্য ছায়াছবি প্রচার-যোগ্য শক্ত জোতজমি প্রস্তুত করলেও), ১৯৬১-র পরই বাঙালি মধ্যবিত্ত বাড়ির অভ্যন্তরে হুড়মুড়িয়ে সেঁধোয়। এর সাথে এ-ও স্মরণীয় : ১৬ জুলাই ১৮৯৪-এ উত্তর কলকাতার বটতলা থেকে প্রকাশিত হয় *কলিকাতার বেশ্যাসঙ্গীত;* এরপর, ১৮৯৭, ১৯১১, ১৯২৯-এ যথাক্রমে ছাপা হয় তিনখানি বই, *থিয়েটার সঙ্গীত ও বেশ্যা সঙ্গীত, বেশ্যাসঙ্গীত ও বাইজী সঙ্গীত;* চার সংকলনে গ্রন্থিত হয় রবিবাবুর দশখানি গান; ১৯২৯-এর *বাইজি সঙ্গীত*-এ প্রবেশিকাগীতিটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি' (১৮৮৮); বলা বাহুল্য, 'obscene and vulgar', (*কলিকাতার বেশ্যাসঙ্গীত* বেরোনো-মাত্র 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ'-এর পুস্তক-চরিত্র নির্ধারণ মোতাবেক), চার বেশ্যাঝকসংহিতার একটিতে স্থান পেয়েছিল ভদ্রমহলে বেবুশ্যের ছলাগীত বলে সাংঘাতিক বিনিন্দিত রবীন্দ্রনাথের 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না'।[১১] এর শাদা মানে, সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে যখন 'রবিবাবুর গান' মোটামুটি অচল, তখনই তার কিয়দংশ বেপাড়ায় ঠাঁই পেয়েছিল।[১২]

১৯৬১-তে আপামর মধ্যবিত্ত গৃহে রাজসমারোহে প্রবেশ করে রবীন্দ্রসংগীত। (পাঁচের দশকে প্রক্রিয়াটির শুরুয়াত হলেও), প্রধানত ওই সূত্রেই দ্রুত ঘটে তার পরিধির সম্প্রসারণ। ১৯৩৭-এ ছায়াছবিতে রবিগীতি অনুপ্রবিষ্ট হলেও, ছয়ের দশকে, সিনেমানুসারী হয় তা—কেবল সুর দিয়ে ফাঁক ভরাবার কিংবা ফাঁক রেখে সুর ছড়ানোর অছিলায় নয়, বরং আখ্যানের মর্মমূল ফেটে উদ্গত হয় রবীন্দ্রসংগীত; যথা : ঋত্বিক ঘটক-এর (১৯২৫-১৯৭৬) *মেঘে ঢাকা তারা* (১৯৬০), *কোমলগান্ধার* (১৯৬১), *সুবর্ণরেখা* (১৯৬৫); সত্যজিৎ রায়-এর (১৯২১-১৯৯১) *কাঞ্চনজঙ্ঘা* (১৯৬২),

চারুলতা (১৯৬৪); তপন সিংহ-এর (১৯২৪-২০০৯) *জতুগৃহ* (১৯৬৪)।[১৩] পারিবারিকতায় সুসিদ্ধ, রবীন্দ্রসংগীত আজ, জন্মদিন থেকে মৃত্যুদিন, নিভৃত প্রেম-নিবেদন থেকে ভাষামুক্তির জোটবদ্ধ সংগ্রাম, বর্ষপালন থেকে বর্ষাপালন, অন্তরঙ্গ বিষাদ বা উদ্ভাসের মুহূর্ত, লঘু চালের জটলা, বারো-মাস-তেরো-পার্বনে দেশের হরেক উৎসব-অনুষ্ঠান-মিলনি, হরেক উপলক্ষের আবশ্যিক অঙ্গ। সেই সহ মধ্যবিত্ত ঘরের পাত্রীর রুচিমনস্কতার, বিবাহযোগ্যতার সনদও বটে। (এক্ষণে তো আবার কলিকাতা কমলালয়ের মোড়ে-মোড়ে, হয়তো-বা, রুটিরোজগারের তাড়ায়-তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত জনতার ফুটন্ত মস্তক-কটাহে শান্তির বারি ছিটোতে, অহরহ বাজে রবীন্দ্রগান, 'বড়ো বেদনার মতো'-ই বাজে, শুকনো বিশীর্ণ 'প্রাণে')।

ইতিহাসে বেনজির এই সর্বব্যাপ্তির মাশুলও কিন্তু রয়েছে—এবং সে-মাশুল শুনতে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকেই। ক্রমশ আরও আরও বদ্ধমূল হচ্ছে ধারণা : এক রবীন্দ্রসংগীতেই ধরা আছে রবীন্দ্রসৃষ্টির সারাৎসার; সুতরাং, বাংলা গদ্যের প্রবলতম সংগঠক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রবন্ধকার, অবিরত পত্ররচক, দিশারী ভাষাতাত্ত্বিক, জাতীয়তাবাদের কড়া সমালোচক, নবশিক্ষার আয়োজক, অজস্র নূতন ছন্দের উদ্ভাবক, অনেকান্ত কবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ঝাপসা-মলিন হলেও, তা সামান্য ক্ষতি কেবল, তাতে মৌলিক কোনো লোকসান নেই। (নিঃস্ব) বাঙালির চোখে এখন অনাত্মীয় সমাজে আত্মশ্লাঘা জাহির করার চরম হাতিয়ার, খাস বঙ্গসংস্কৃতির পরম অভিজ্ঞান, 'রবীন্দ্রসংগীত'। রবীন্দ্র-উপমা ধার করেই বলা যায় : রবীন্দ্রনাথের 'সকল শক্তিই আজ [তাঁর সুর-রূপী] জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে'[১৪]; এবং এদ্দরুন, বেশি দেরি নেই আর, 'আপনার সম্পদ হইতে আপনি বঞ্চিত'[১৫] হব আমরা, যে-দরিদ্রতা নিজ ঐশ্বর্য সম্পর্কে অনবিহিতির পরিচায়ক, শোচনীয় সে-রিক্ততায় আপন্ন হব।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর গীতাবলি আজকের মতো উদার ছাড়পত্র পায়নি। প্রসঙ্গটিকে খোলসা করতে তাঁর গানের বাণী-সংকলন *গীতবিতান*-এর ইতিহাস খানিক ঝালিয়ে নেওয়া যাক।[১৬] ১৯৬১-র ত্রিশ বৎসর পূর্বে, রবীন্দ্রনাথের সত্তরবর্ষপূর্তি জয়ন্তী-উৎসবের সময় সিদ্ধান্ত হয়, তাঁর সমস্ত গান একজায়গায় জড়ো করা হবে। খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় কাজ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে এবং বিশ্বভারতী-র কর্মী, রবীন্দ্রপরিকর সুধীরচন্দ্র কর-এর সম্পাদনায়, ১৯৩১-এ বেরোয় *গীতবিতান* ১-ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৩২-এ ৩-য়। প্রতি খণ্ডের মুদ্রণসংখ্যা ২২০০। কিন্তু সে-সংগ্রহে

আদবে খুশি হন না রবীন্দ্রনাথ। তা-ই এবার নিজের কাঁধেই তুলে নেন সম্পাদনার ভার। গানগুলিকে 'পূজা', 'স্বদেশ', 'প্রেম', 'প্রকৃতি', 'বিচিত্র' ও 'আনুষ্ঠানিক' নাম-পর্যায়ে দুই খণ্ডে সাজিয়ে নেন খোদ কবি : ১৯৩৯-এ বেরোয় তার ১-ম খণ্ড, ১৯৪০-এ ২-য়। *গীতবিতান* আদি সংস্করণের বছর আট পরে প্রকাশ পেলেও নবীকৃত *গীতবিতান*-এর কিন্তু তেমন কাটতি হয় না—হয় না, তার কারণ, ১৯৪০-এও আদি সংস্করণের কপি অ-বিক্রিত পড়েছিল। স্বল্পসংখ্যায় ছাপা রবীন্দ্র-সম্পাদিত *গীতবিতান*-এর কপালে জোটে আখ্যা : 'বিরলপ্রচার'। এরপর, কবিপ্রয়াণের ছয় মাস পর, ১৯৪২-এ, 'বিরলপ্রচার'-এর সামান্যত অদল-বদল করে পুনঃ উপস্থাপিত হয় রবীন্দ্র-পরিকল্পিত দু-খণ্ড *গীতবিতান*। ১৯৪৫-এ বেরোয় তার ৩-য় খণ্ড—যুক্ত তাতে নৃত্যনাট্য ও অন্যান্য উপাদান। পৌষ ১৩৫২-য় (১৯৬৫/৬৬) বাজারে আসে, এখন ঘরে-ঘরে শোভমান, অখণ্ড *গীতবিতান*।

ক্রমশ সুলভ থেকে সুলভতর হয় রবীন্দ্র-গীতের বাণী। ধীরে-ধীরে, কাব্যগ্রন্থে নেই অথচ *গীতবিতান*-এ আছে, এমন-সব গানও কবিতার মর্যাদা পেতে শুরু করে। এই নিরিখে, সময়ের ঢের আগের মানুষ, বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)।

রবীন্দ্রনাথের আশিতম জন্মদিনে, *কবিতা* পত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের গান'-এ (১৯৪১) সবলে ঘোষণা করেন বুদ্ধদেব, 'সমগ্র [রবীন্দ্র] রচনাবলীর মধ্যে গানগুলি সবচেয়ে রাবীন্দ্রিক'।[১৭] গান বলতে যত-না সুর, তার চেয়ে কথা-র মাধুরীআস্বাদের উপরেই যে তাঁর বেশি ঝোঁক, তা আরও পরিষ্কার, বুদ্ধদেব-এর 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য-গান' (১৯৪৪) প্রবন্ধে—এরই পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত রূপ, 'রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্য ও গদ্য' (১৯৬১)। এতেই মেলে ব্যাখ্যা, কেন, *চণ্ডালিকা* নৃত্যনাট্যের 'ঘুমের ঘন গহন হ'তে যেমন আসে স্বপ্ন' (১৯৩৮), কেবল 'আন্তরিক মূল্যে গরীয়ান' নয়, সেই সঙ্গে তা 'রবীন্দ্রনাথের [তাবৎ] সুরাশ্রিত কবিতার মধ্যে' যথার্থ 'অমিত্রাক্ষর'।[১৮] সুরাবরণ সরিয়ে *গীতবিতান*-এর কাব্যবস্তুকে পুরোভাগে আনার বুদ্ধদেব-প্রবণতা পূর্ণ পরিণতি পায় বুদ্ধদেব-সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা*-য় (১৯৫৪)—সেখানে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের ১৬-টি কবিতার মধ্যে ৪-টি ছিল গান, 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি', 'নীলাঞ্জনছায়া', 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' এবং 'ঘুমের ঘন গহন হ'তে'।[১৯] (অতএব, এতে আর কী আছে যে, ২২ শ্রাবণ ১৯৪১-র করুণরঙিন দিবসটি যে-উপন্যাসের প্রাণবিন্দু, সেই বুদ্ধদেব বসুর *তিথিডোর*-এ [১৯৪৯] 'রবীন্দ্রসংগীত' বাগবন্ধটি নেহাত আলগোছে ব্যবহৃত হয়, প্রেয়সীকে বিরলপ্রচার/

সুলভপ্রচার দু-খণ্ড *গীতবিতান* উপহার দেওয়ার মুহূর্তে কবিজনোচিত ভঙ্গিতে বলে প্রেমিক, 'রবীন্দ্রনাথের গান তো শুধু কান দিয়ে শোনবার নয়, মন দিয়েও পড়বার'।[২০])

শব্দানুগমনের এ স্রোতেই আসে আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর মরমী প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান' (১৯৬৯)—এতে কবিতা-রূপে কদরযোগ্যতার মহিমা পায়, এমন-কি, রবীন্দ্রনাথের সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ রচনা, 'কিছুই তো হল না' (১৮৮১)।[২১] সত্যি-কি, *গীতবিতান*-এর কল্যাণে উদ্ভব হয় আজব এক প্রহসন : সহসা যেন রবীন্দ্র-উত্তর কবিরা আবিষ্কার করেন, রবীন্দ্রকাব্যের দুর্মোচনীয় ঘোর-অভিভব ঘোচাবার শাণিততম আয়ুধটি গচ্ছিত আছে গীতিকার রবীন্দ্রনাথের জিম্মায়। সুরস্মৃতি-মেশা-বাণীর অব্যাহত অর্চনায় একে-একে পাই আমরা তীক্ষ্ণ অনেক লেখা—যথা, অমিয় চক্রবর্তী-র (১৯০১-১৯৮৬) 'গানের গান' (১৯৪৩), 'রবীন্দ্রগীতির অন্তরা' ১৯৬১)। সুর নয়, কথাই যে প্রধান বিবেচ্য, এর নিঃসংশয় প্রমাণ, 'রবীন্দ্রগীতির অন্তরা'-র অবিশ্বাস্য এক প্রমাদ : শিরোনাম থেকে শুরু করে সারা নিবন্ধে অমিয় চক্রবর্তী, (বঙ্গগীতিতে মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের সংযোজন) 'সঞ্চারী'-র আলোচনায় অনবরত লিখে যান 'অন্তরা'।[২২] *গীতবিতান*-নির্ভর রচনাপ্রবাহে অবশ্যই উল্লেখ্য, শঙ্খ ঘোষ-এর (জন্ম. ১৯৩২) সাতের-আটের দশক ধরে 'রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে লেখা প্রবন্ধের সংকলন'[২৩] *এ আমির আবরণ* (১৯৮২), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-এর (জন্ম, ১৯৩৩) 'শব্দের মুক্তি ও রবীন্দ্রসংগীত' (১৯৮৬)।[২৪] কাব্যবই হিসেবে *গীতবিতান*-এর জয় যে আজ পূর্ণসফল তার পরোক্ষ সাবুদ সাম্প্রতের কবিতা—রবীন্দ্রোত্তর-উত্তর কবিদের ছত্রে-ছত্রাড়ালে রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ যা থাকে তার প্রায় ষোলোআনাই রবীন্দ্রগানের (ছিন্ন) উদ্ধৃতি-ভরা। সে-কবে, ১৯৬১ সনে, খেদ জানিয়েছিলেন (রবিবাণীর মুগ্ধ পূজারী) স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু, 'শিক্ষিত তরুণেরাও [রবীন্দ্রনাথের] গানের দ্বারা যতদূর মোহিত তাঁর পঠনীয় রচনাদির সঙ্গে ততদূর পরিচিত নন'।[২৫]

সমাজদেশে রবীন্দ্র-গানের বাণী ও সুরের রমরমার পরিপ্রেক্ষিতটি যখন ছিল না, ছিল না সহজ-ব্যবহার্য *গীতবিতান* বা *স্বরবিতান*—*স্বরবিতান*-এর প্রকাশধারার সূচনা-বর্ষ, ১৯৩৫—তখন কী ছিল পরিস্থিতি, তা বুঝতে আমাদের ফিরতে হবে সবিশেষ এক স্থানিক পরিসরে, (চিরকেলে সেই) *বৈঠকখানা*-য়।

২

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা, পাবলিক ভাষণের তারিখ, ১৯ এপ্রিল ১৮৮১।

বেথুন-সোসাইটি আহূত সে-সভা বসে মেডিকাল কলেজ হলে; এবং, তার পৌরোহিত্য করেন, ডিরোজিও-অনুপ্রাণিত প্রচল-বিরোধী 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)।[২৬] এ-তথ্যটি নিশ্চয় স্মর্তব্য : পাবলিক বক্তা হিসেবে উদয়-ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য, রাষ্ট্র-শিক্ষা-রাজনীতি কিংবা নারীনির্যাতন নয়, ছিল বরং সংগীতের দুর্দশা। (এর সহিত এ-ও নোটব্য : পরিমাণের অঙ্কে, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-মধ্যে—চিঠিপত্র, আলাপ-আলাপচারিতা নয়, তর্কমল্ল-এর অহৈতুকী গরজে বিরজিত গদ্যে—অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় 'সংগীত' তেমন ভারি নয়; ও-প্রসঙ্গে, গুটিকয় তাঁর নিবন্ধের ভিতর উল্লেখযোগ্য, 'সংগীত ও ভাব' [১৮৮১], 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা ও [১৮৮১], 'বাউলের গান ১' [১৮৮৩], 'বাউলের গান ২' [১৮৮৪], 'সোনার কাঠি' [১৯১৫], 'সংগীতের মুক্তি' [১৯১৭]; অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের গানভাবনা তাঁর প্রথম যৌবনেই এমন পাকা হয়ে গিয়েছিল যে, 'পুনরুক্তির সম্রাট' রবীন্দ্রনাথ-ও তা নিয়ে পরিণত বয়সে, নিদেন সুষ্ঠু প্রবন্ধাকারে, তেমন কচলাননি)। মনে রাখা ভালো, ১৮৮১ অব্দি তরুণ রবির মোট গানের সংখ্যা ছিল, আনুমানিক, ৬৮।[২৭]

বিশ বছরের যুবক গান গেয়ে-গেয়ে প্রথাবদ্ধ গায়ননীতির বিরুদ্ধে জেহাদি যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন ১৮৮১-র ১৯ এপ্রিল, নিঃশংকতার সে-প্রদর্শনীতে মুগ্ধ, তার বিস্তর তারিফ করেন আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ সভাপতি—'সংগীত ও ভাব' নামধেয় ভাষণটিতে সাতিশয় তৃপ্ত কৃষ্ণমোহন, 'বন্দে মাল্মীকিকোকিলাং' বলে অভিবাদন জানান রবীন্দ্রনাথ-কে।[২৮]

অতিরিক্ত এ তথ্যটিও কম সংকেতক নয় : বয়সোচিত ঔদ্ধত্যে ভরভরন্ত 'সংগীত ও ভাব' সাধারণমঞ্চে পাঠ করার মাস কয়েক আগে, ১৮৮১ সনেই, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন নিতান্ত মৎময় আর্ত-বিধুর গান, 'কিছুই তো হল না/সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকাররব/...কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই, /কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই...'।

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নালিশ তথা প্রস্তাব ছিল :[২৯]

■ পূর্ণাঙ্গ যে-ভাষার ব্যাকরণ, সে-ভাষা মৃত। যে-সাহিত্যে অলংকারশাস্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব, সে-সাহিত্যের কবিতা অন্তর্জলিযাত্রার জন্য প্রস্তুত। সংগীতের ক্ষেত্রেও একই নিয়তির বিধান।

■ রাগরাগিণীর শুদ্ধতা বজায় রাখার দিকেই কেবল হালের ওস্তাদ এবং তস্য পৃষ্ঠপোষকের আগ্রহ। শাস্ত্রিক অনুশাসনের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগের দুষ্কারণে, বাঁধাধরা রাগরূপের ওপরেই লোকের খেয়াল, রাগগত ভাব নিয়ে বড় কেউ ভাবিত নন। অতএব, মার্গীয় গায়ন যে একঘেয়ে, যান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ, হয়রান-করা অনর্থক সুরদৌড়ের নমুনা হয়ে উঠছে, এতে তাজ্জবের কিছু নেই।

■ সুর-নিহিত ভাবকে চেপে-মেরে তার বাহ্যআকারের বাহাদুরি বন্দনায় 'রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভাবটিকে হত্যা' করে অন্যায্য উপায়ে গানের 'সিংহাসন' দখল করে ফেলেছে।

■ অথচ, সম্প্রতি 'অলংকারশাস্ত্রের পিঞ্জর' হতে বেরিয়ে পড়েছে বাংলার কবিতা। তা-যদি হয়, তাহলে তেমনটি কেন বাংলা সংগীতের বেলায় হবে না?

■ মৃত নিয়মের গোলামগিরি, 'অন্ধ দাস্যবৃত্তি' বন্ধ না হলে ভাবমুক্তির আশা নেই।

■ ছকে-ফেলা, ঢালাই-করা রাস্তা ছাড়তে ইচ্ছুক যে, অজান পথের অন্বেষক সেই বিহারীকে স্বহস্তেই খুঁড়তে হয় নিষ্ক্রমণের পথ।

(রবীন্দ্রনাথ-এর স্বীয় ইস্তেহার অনুযায়ী:)

➤ যদি কারো কানে 'মধ্যমের স্থলে পঞ্চম' বেশি আয়াসের হয়, তবে তা-ই যেন দেয় সে—শাস্ত্রমতে ওই বেনয়মি প্রয়োগে জয়জয়ন্তী বাঁচলেন না মরলেন, সেই ফজুল ব্যবচ্ছেদে সময় বরবাদ করার তিলেক দরকার নেই।

➤ তালের কড়াকড়ি শিথিল করা আবশ্যক। মাত্রা-বিভাগ বহাল রইলেও, নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফেরার বাধ্যবাধকতা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। স্থলবিশেষে, একেবারে তালরহিত হওয়া যুক্তিসহ ও সমীচীন।

➤ ওস্তাদি জগঝম্পে, তানের হুড়োহুড়িতে, সবচেয়ে মার খায় পদাবলি। শব্দগুচ্ছ নিয়ে অবিবেকী, আসুরিক অনাচারের প্রতিবিধান হয় কিসে? —হয় যদি, কোনো দরদি, গানের কথার ওপর সুর নয়, সুরের ওপর দাঁড় করায় তার গানের কথা।

'সংগীত ও ভাব'-এ জোর গলায় হাঁকা 'যুদ্ধং দেহি' ডাকটি বাকি জীবনে বারংবার ছেড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে, রণঘোষে অক্লান্ত রইলেও, গানে বাণীর ভূমিকা নিয়ে মঞ্চ তোলপাড়-করা মন্তব্যটি পরে তিনি প্রত্যাহার করেন—প্রত্যাহার করেন, আশ্চর্যত, *গীতাঞ্জলি* পর্বে পৌঁছে। (বাংলা) *গীতাঞ্জলি*-র (১৯১০) মোট ১৫৭-টি কবিতার ৮৫-টি

ছিল সুরে খোদাই-করা। আর কি-না, বইখানি প্রকাশের দু-বছরের মাথায়, ১৯১২-র 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ'-এ 'সংগীত ও ভাব'-এর আংশিক সমালোচনাপূর্বক বলেন রবীন্দ্রনাথ · 'যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব।...গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র।...বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব'।[৩০]

দরবারি কিন্তু গতিস্তব্ধ, নিরীক্ষারহিত, গতানুগতিক কলাচর্চার পীঠ-থান-কে তত্ত্ব-শনাক্ত করতে রবীন্দ্রনাথ বেছেছিলেন গৃহস্থাপত্যের রূপক। খোপে-খোপে বিভক্ত, মর্দনাঞ্চল-জেনানাঞ্চলে সাজানো মহলদার বাটী তাঁর প্রিয় উপমাস্থল। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-দৃষ্টিতে · লুপ্ত কোনো অতীতে, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ধনীজনের বাড়ি (বা বাড়ির উঠোন), নিদেন সংগীতপিপাসুদের খাতিরে, সমাজের ছোটো-বড়-র মিলনক্ষেত্র ছিল—'বুনিয়াদি' অর্থবানের দাক্ষিণ্যে আয়োজিত হতো সেখানে 'গীতবাদ্যের পরব', 'বারোয়ারি' সব অনুষ্ঠান ('সংগীত' · ১৯১২)[৩১], পৃষ্ঠপোষণার সে-বন্দোবস্ত অন্তর্হিত এখন, নেই আর গণসাধারণের জন্য সাদর অভ্যর্থনার কোনোরকম—(নিশ্চয়, নানাবিধ আর্থ-সামাজিক রদবদলের দরুন) 'গান' বস্তুটি এখন (বাবুদের) *বৈঠকখানা*-য় আবদ্ধ, এমন এক দস্তুরের বন্দীশালায়, যেখানে (কতিপয় মনিবের মনোরঞ্জন লাগি) 'সমের কাছে খুব জোরে মাথা নাড়া'-র মোসাহেবিপনাই আদব-সংগত ('সোনার কাঠি' : ১৯১৫)[৩২]; তবে, মুশকিল এই, (বাবুলোকে সে-সমাচার না গেলেও), সমাজমনে ইদানীং অ-স্থিরতার ঢেউ উঠেছে—আর সেই বেগ-ব্যাকুলতার ঠেলায় 'গান'-ও 'বৈঠকখানা' ছেড়ে 'মুসাফিরখানা'-র সন্ধানে ব্যাপৃত ('সোনার কাঠি')[৩৩]। 'বৈঠকখানা'-র ভব্যতা তথা দাসত্বের নিশ্চল *স্থায়ী* নয়, বিশ্রামের জন্য প্রয়োজন ক্ষণিকের আশ্রয় 'মুসাফিরখানা'-র *সঞ্চারী*—রবীন্দ্রনাথের এই দাবি পালটে দেয় সংগীতের স্থাপত্য-রহস্য। এরপর, খুব বিস্ময় লাগে না দেখে যে, রবীন্দ্রনাথের চার তুকের গানে, কথা ও সুর দু-স্তরেই, তৃতীয় তুক 'সঞ্চারী'-ই সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত, সবচেয়ে সাহসী এবং অমোঘতায় অনর্গল। প্রসাধনের এ অভিনবত্বের পাশাপাশি চলে তাঁর গৃহগত উপমার বৈপ্লবিক সঞ্চার। পুং-শাসিত, নিশ্ছিদ্রভাবে সমলৈঙ্গিক পরিসর 'বৈঠকখানা' পরিত্যাজ্য হলে কি গীতিহীন 'অন্তঃপুর' আপনা হতেই 'মুসাফিরখানা'-র নতুন এক ঠিকানা হয় না?

গোড়ার অধ্যায়ে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, স্বজনবর্গেই, তাঁর 'গীতসহচরী' হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন চার মহিলাশিল্পী—তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্রী, প্রতিভা-ইন্দিরা-অভিজ্ঞা এবং এক ভাগিনেয়ী, সরলা।[৩৪] ২৬ জানুয়ারি ১৮৮১-তে, যে-নাটকে রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হন রবীন্দ্রনাথ সে-ই *বাল্মীকিপ্রতিভা*-র নামের মধ্যে সরস্বতী-রূপে প্রতিভা-র গান-অভিনয়ের 'ইতিহাসটুকু' প্রচ্ছন্ন আছে।[৩৫] শান্তিনিকেতন অধ্যায়ে আরও অনেক গায়িকা তাঁর সুর-সান্নিধ্যে আসেন। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে এই মহিলাবৃন্দের ভূমিকা বিরাট। কোন্ উপায়ে অনুধাবন করা যায় তার তাৎপর্য?

রবীন্দ্রনাথের বহু কৃতিত্বের ভেতর একটি : সোপার্জিত সুরকে স্বরলিপির কাঠামোয় ধরে রাখার জেদ ও সে-অনুযায়ী সমর্থ এক স্বরলিপিকার-বাহিনীর গঠন। (পত্রিকার পাতায় স্বরলিপি মাঝেসাঝে বেরোলেও), তাঁর গান যথাযথভাবে—অর্থাৎ, তাকে চলতি বৈঠকি সুর-তানে অনূদিত না করে, তার যা শাস্ত্রীয় বিধি অতিক্রম করার নিষ্ঠুর তাপ-দ্রোহ, তা অক্ষুণ্ণ রেখে—গাওয়া হচ্ছে কি-না, এ নিয়ে জীবনের শেষ ভোর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ ছিল। ১৯১২ সালে—তদ্দিনে, ১৯০৫-এ স্বকণ্ঠে যাত্রারম্ভ করে, ১৯০৮ থেকে ১৯১২, এই পাঁচ বছরে, অন্তত তেরোজনের গলায় 'প্যাথে-এইচ, বোসেজ রেকর্ড', 'নিকোল রেকর্ড' ইত্যাদিতে রবীন্দ্র-গান মুদ্রিত হয়ে গেছে[৩৬]—গ্রামোফোন-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বেশ উষ্মা ভ'রে নালিশ দায়ের করেন রবীন্দ্রনাথ : 'আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে-সকল সুর বাজিতেছে...[তাহাতে] আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদর্যতা প্রকাশমান...'।[৩৭] ঘোর এ বিবমিষা সত্ত্বেও, স্বভাবত তাঁর বিষয়বুদ্ধির জোরেই নিশ্চিত, নতুন মাধ্যমটি কিন্তু এড়িয়ে যান না তিনি। বরং, 'কদর্যতা'-র বিপক্ষে সংগ্রাম ও সুন্দরের অভিনন্দনের প্রয়োজনে তাকেই লাগান কাজে : ৫ অক্টোবর ১৯২৬, 'দ্য গ্রামাফোন কম্পানি লিমিটেড'-এর সঙ্গে আইন-মাফিক চুক্তি করে কয়েকখানি গান-কবিতা রেকর্ড করেন রবীন্দ্রনাথ।[৩৮] এর চেয়েও বড় একটি ব্যাপার (পরোক্ষত) ঘটান তিনি।

১৯১৫-র আগে হতেই আরম্ভ, তবে ১৯১৬-র পর থেকে 'রবিবাবুর গান'-এর রেকর্ড-সংখ্যা দুদ্দাড়িয়ে বাড়ছে; ভিড় জমাচ্ছেন অনেক শিল্পী—এঁদের মধ্যে আবার পুরুষেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ; অথচ, ব্যতিক্রম নেই, সুর তো বটেই, কথাও এলোমেলো সে-সমস্তে। সমূহ এ অব্যবস্থা—স্বাধীনতার নামে যা-ইচ্ছে-তাই (= যাচ্ছেতাই) কারবার —সামলানো যায় কী প্রকারে? (গল্প চালু আছে), কে. মল্লিক-এর 'আমার মাথা নত

করে দাও হে' শ্রবণে অপরিসীম পরিশান্ত, গানটি ('রবীন্দ্রসংগীত' শব্দের স্রষ্টা) দিনেন্দ্রনাথ-কে দিয়ে পুনঃরেকর্ড করান রবীন্দ্রনাথ।[৩৯] এর পার্শ্বাপার্শি মাঠে নামেন খোদ নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ-দ্বারা প্রশিক্ষিত গায়িকাকুল। এঁদের সর্বপ্রথম অমলা দাশ—১৯১৫-র ভেতরেই তিনি রেকর্ড করেন চব্বিশখানি গান; (১৯১৫ অব্দি পর্বে কেবল-আর একজন রবীন্দ্রনাথের কাছে সরাসরি সংগীতশিক্ষা পেয়েছিলেন—তিনি, দুটি গানের গায়ক, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র); ১৯১৬-১৯২৫, এ দশ বছরে প্রকাশিত (অন্তত) সত্তরটি গানের মধ্যে মাত্র দুটি ছিল রবীন্দ্র-দীক্ষিত শিল্পীর, অমলা দাশের বোনঝি, সাহানা দেবীর; তবে, পরবর্তী দশ বছরে, ১৯২৬-৩৫, রবীন্দ্রসুরবিশ্বস্ত গায়িকা ও গান, নিছক গাণিতিক অঙ্কে, রীতিমতো বিশাল—উমা বসু, মণিকা দেবী, মেনকা মুখোপাধ্যায়, রমা মজুমদার, সতী দেবী, অমিতা সেন (খুকু), এবং সর্বোপরি, কনক দাশ—এক কনক দাশই বত্রিশখানি গান রেকর্ড করেন; ১৯৩৬-৪১ কালপর্বে এ প্রবণতা আরও উচ্চকিত—এই আট বছরের মহিলা-শিল্পীদের নামতালিকায় আছেন, অমিতা সেন (খুকু), অমিয়া ঠাকুর, কণিকা মুখোপাধ্যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়), চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, বিজয়া দেবী (দাশ), রাজেশ্বরী দত্ত (বাসুদেব), ইলা মিত্র, মালতী ঘোষাল, শান্তা আপ্তে, সতী দেবী, রেবা মজুমদার, শৈল দেবী—এবং আবার, কনক দাশ-এর একক-কণ্ঠে গাওয়া গানের সংখ্যা সর্বাধিক, আঠাশখানি; ১৯৩৭-এর পর, সিনেমা-সূত্রে যোগ দেন, কানন দেবী, যূথিকা ঘোষ, সুপ্রভা সরকার।[৪০] সিদ্ধার্থ ঘোষ-এর পরিশ্রমী সমীক্ষা *রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত* (১৯৮৯) দিচ্ছে সাফ প্রমাণ : স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাসন ১৯০৫ হতে রবীন্দ্রবিদায়সন ১৯৪১ অব্দি, (ক) গোড়ার পর্যায়ে 'গায়কদের প্রাধান্য সত্ত্বেও, গায়িকা ও গায়িকা-কণ্ঠে গানের সংখ্যার বৃদ্ধির হার গায়ক ও গায়ক-কণ্ঠে গানের সংখ্যার বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি'; (খ) 'গায়িকা সংখ্যা গায়কদের অতিক্রম করার পূর্বেই গায়িকা-কণ্ঠে গানের সংখ্যা গায়ক-কণ্ঠে গানের সংখ্যাকে অতিক্রম' করে।[৪১]

এ নিশ্চয় অতিরঞ্জন নয় যে, গ্রামোফোনের মারফত (শ্রীহীন, আলুথালু) 'রবিবাবুর গান'-কে (সুসংহত) 'রবীন্দ্রসংগীত'-এর কিনারে উপনীত করার আয়াস-প্রয়াসে ভদ্রলোকের তুলনায় ভদ্রমহিলারা অধিক প্রাগ্রসর। (পুরুষদের কীর্তি, যেমন, বেতারে পঙ্কজ মল্লিক পরিচালিত 'সংগীতশিক্ষার আসর', উপেক্ষা না-করেও বলা যায়), এখন যে রবীন্দ্রসংগীত, মধ্যবিত্ত প্রাঙ্গণে দৈনন্দিনে শামিল, নরনারী নির্বিশেষে সবারই গেয়, সে কৃতিত্বের গুরু-অংশ মেয়েদের পাওনা।

স্থাপত্য-রূপকে, এর অর্থ : বৈঠকখানায় প্রবেশ-নিষিদ্ধ, অন্তঃপুরে পর্দানশিন জেনানার প্রতিভূ কিছু মহিলার ছিল, বাংলা গীতভবনের নকশা পালটাবার দুঃসাহসিক কাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, শাস্ত্রভজা, পুনরাবৃত্তিময় গায়ন-ঘাঁটির স্থাননাম 'বৈঠকখানা'; পুং-মৌরসিপাট্টার সে-আখড়ায় বিপর্যাস ঘটাতে তিনি যা গড়েন, তা স্রেফ প্রতীকী মাত্রায়, 'অন্তঃপুর'-এর গান—'অন্তঃপুর'-ই 'মুসাফিরখানা'। তার অজস্র আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের দুটি : *লাবণ্যের পরিমিতি* ও *ভাসমান 'আমি'-কে উপলক্ষ করে অপরিমিত নাট্যমুহূর্তের সংরচন*। প্রথম বিশেষত্বের দরুন, নামঞ্জুর সেখানে বাহুল্যের বিলাস; দ্বিতীয় বিশেষত্বের দরুন, সম্ভব সেখানে গায়কির বিভিন্নতা। সেই সহ, ও-দুই বৈশিষ্ট্য একাধার বলে তাদের আন্তঃ-রসায়নে নাড়া লাগে অবচেতনে, নানান সংগুপ্ত, প্রতিহত, অবদমিত বাসনা-লেশ বর্ণিল বাঙ্‌রূপ পায়—বলার অপেক্ষা লাগে না, অবচেতনে ওই হলচল, *চারিত্র্য*-এ স্ত্রী-জাতীয়। এখনও-যে হাড়পাকা পুরুষেরা রবীন্দ্রসংগীতকে 'ন্যাকা' তথা 'মেয়েলি' জ্ঞান করেন, সইতে পারেন না তার *সংবৃতি* ও *বিততি*-র, *রুদ্ধ* ও *মুক্ত এষণা*-র যৌগঅভিঘাত, তার কারণও ওই। তবু, মন্দের ভালো, মেয়েদের সক্রিয় অংশীদারিতে পরিগঠিত রবীন্দ্রসংগীত, ক্ষমতাসুখবিভোর পুং-অবচৈতন্য-কে (যার ভাগীদার উভয়ত ছেলে-মেয়ে), খানিক নমিত-শমিত করার পুণ্যব্রতে আজও নিয়োজিত।

পরিশেষ

তবে, এমন দিন যদি আসে—বর্তমানের দুঃসময়ে, বলশালীদের নিয়মিত নিষ্ঠুর পেশী-আস্ফালনে, তার পূর্বাভাস যথেষ্ট প্রকট—বাঙালি-মন থেকে কেটে গেল রবীন্দ্রসংগীত-এর ছায়াঘোর, বিলকুল মুছে গেল কথাসুর-সহকারিত্বের দুর্লভ অনুভব, তবু, আমার মতন অসংশোধনীয় রবি-অনুরাগীর পক্ষে এটুকু সান্ত্বনা রইবে যে, নিদেন আন্তর্জাল-ভাঁড়ারে মজুত থাকবে তার কিছু-না-কিছু চিহ্ন-অবশেষ। কে বাধা দেয় যদি, ঘরের কোণে, বিজনে শুনি, রবীন্দ্রনাথের উনআশি বছরে বয়সে লেখা গান, পঁচাশি-উত্তর বিজয়া চৌধুরীর গলায় :

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে
তুমি জান না, আমি পেয়েছি তোমারে অজানা সাধনে।

তথ্যসূত্র

১. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ২০০৮, পৃ. ১২, ১২৯-১৩০
'(তোমার) ভুবনজোড়া আসনখানি' রচনার পরের দিন (৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩) *জাপানযাত্রী*-র (১৯১৯) রোজনামচায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'কাল সমস্ত রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েছে...রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন...[জাহাজের] একধারে দাঁড়িয়ে ঐ বাদলার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলুম—শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে। এমনি করে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলুম, বানিয়ে বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলুম—' দ্র: *জাপানযাত্রী*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দশক খণ্ড, কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ. ৪১৬
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৯২৩-তেই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে চিঠিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টিবাদল শুরু হল। ডেকে কোথাও শোবার জো ছিল না। অল্প একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম 'শ্রাবণের ধারার মতো', তারপরে 'বীণা বাজাও', তারপরে 'পূর্ণ আনন্দ', কিন্তু বৃষ্টি আমাব সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলল—তখন একটা নূতন গান বানিয়ে গাইতে লাগলাম। ...গানটা সকালেও মনে ছিল (সেটা নিচে লিখে দিচ্ছি) "বেহাগ তেওড়া"...'
উদ্ধৃত : সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ১৩০

২. Indira Biswas, *Performers and Performances Broadcasting of Bengali Songs through the Calcutta Radio Station (1927-1947)*, 'Archive Series 06', Kolkata : Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSC), 2014, pp. 14-15.

৩. সিদ্ধার্থ ঘোষ, *রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত*, কলিকাতা : ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন, ১৯৮৯, পৃ. ২৫

৪. সুধীর চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রসংগীত : বাংলা গানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব', *গানের লীলার সেই কিনারে*, কলকাতা : প্রতিভাস, ১৯৮৪

৫. শুভ গুহঠাকুরতা, 'নূতন তালের গান', *রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা*, সম্পাদনা, সুব্রত রুদ্র, কলকাতা : আশা প্রকাশনী, ১৯৭৯, পৃ. ১৩৮-১৩৯
সুভাষ চৌধুরী, 'রবীন্দ্রসংগীতে তাল', *গীতবিতানের জগৎ*, কলকাতা · প্যাপিরাস, ২০০৪, পৃ. ৫০৯

৬. সত্যজিৎ রায়, 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা', *রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা*, সম্পাদনা, সুব্রত রুদ্র, কলকাতা : আশা প্রকাশনী, পৃ. ৮৫-৮৬

৭. তদেব, পৃ. ৮৬

৮. বিজয়া চৌধুরী, *সিলেট কন্যার আত্মকথা*, কলকাতা অনুষ্টুপ, ২০০৪, পৃ. ১৯-২০

৯. তদেব, পৃ. ৩৬, ২৬, ৬০-৫২-৬৮-৬৯-৯৬-৯৫, ৫৫, ৬৯-৭০, ৭১, ৭৫-৭৬, ১৩১-১৩৫

১০. সুধীর চক্রবর্তী, 'অসমতলের সৃজন', *রবিকররেখা*, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৪, পৃ. ২৫৯

১১. এ-প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :
দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সবিস্তার', *বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত*, সমন্বয়-সম্পাদনা : দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ২০০১, পৃ. ৪৩-৭২

১২. (ক) ১৯৭৯ সনের একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস (১৯১১-১৯৮০) : 'আমার প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিল না এবং শুধু আমি নই তখনকার দিনে শুধু কয়েকজন রবীন্দ্রভক্ত ছাড়া কেই রবীন্দ্রসংগীতকে পাত্তাই দিত না। ...তখনকার দিনে আজকালকার মতো স্বরবিতান নামধারী কোন স্বরলিপির বই ছিল না। ছিল কয়েক খণ্ড গীতলিপি আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারখণ্ড স্বরলিপির বই।' —দেবব্রত বিশ্বাস, 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার', ১৯৮০

(খ) '...মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথের গানে [র] যথার্থ প্রসার, গত শতকের পঞ্চাশের দশকে এবং তার অব্যবহিত পরে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের উন্মাদনাকে কেন্দ্র করে'। —অশোক মিত্র, 'আর্বপ্রয়োগের অধিকার', ২০১২

(গ) 'রবীন্দ্রসংগীতের যে পরিমণ্ডল আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে [তা] তাঁর মৃত্যুর পর, রবীন্দ্রনাথের গানের উত্থান হয়েছে শতবর্ষ থেকে'। —সুধীর চক্রবর্তী, 'স্রষ্টা এবং শিল্পী', ২০১০

(ঘ) 'এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, [দেবব্রত বিশ্বাসের] শিক্ষাজীবনে রবীন্দ্রসংগীত কথাটা প্রচলিত ছিল না। লোকে বলতো "রবিবাবুর গান"।' —গোলাম মুরশিদ, 'দেবব্রত বিশ্বাস ও শিল্পীর স্বাধীনতা'

(ঙ) '১৯৬১তে শততম রবীন্দ্রজয়ন্তীর পর থেকে রবীন্দ্রসংগীতের সমাদর ক্রমেই ব্যাপক হয়েছে। ...ক্রমেই আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের একটা সমারোহময় যুগে পৌঁছেছি।' —সত্যজিৎ চৌধুরী, 'তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার'

(চ) 'রবীন্দ্রসংগীতের বিষয়টি ছিল জনপ্রিয়তার ব্যাপক বৃত্তের বাইরে...১৯৬১-তে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আগে রবীন্দ্রসংগীত জনসাধারণের ব্যাপক বিনোদনের বিষয় হয়ে ওঠেনি।' —পবিত্র সরকার, 'জর্জদা'

দেবব্রত বিশ্বাস, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, (ক) পৃ. ১৩৭-১৩৮, (খ) পৃ. ১৮৫, (গ) পৃ. ১৯৬, (ঘ) পৃ. ২৫০-২৫১, (ঙ) পৃ. ২৬৯-২৭০, (চ) পৃ. ২৯০

১৩. Parimal Ray and Kazi Anirban (eds.) *A Directory of Bengali Cinema*, Kolkata : The Colours of Art, 2013

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীতের মুক্তি' (১৯২৪), *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ. ৬৬

১৫. তদেব, পৃ. ৬৬

১৬. প্রবীর গুহ ঠাকুরতা, 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বিরলপ্রচার *গীতবিতান*', *গীতবিতান*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭, পৃ. ১৩-১৪

প্রবীর গুহ ঠাকুরতা, 'প্রসঙ্গ *গীতবিতান* গ্রন্থের সংস্কার', *রবীন্দ্রনাথের গান*, পৃ. ১১৫

১৭. বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথের গান', *বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত গদ্য : 'কবিতা' থেকে* (২-য় খণ্ড), সম্পাদনা · দময়ন্তী বসু সিং, কলকাতা : বিকল্প, ২০১১, পৃ. ১০৪

এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য · সুধীর চক্রবর্তী, 'কবির চোখে গীতিকার', *রবিকররেখা*, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৪, পৃ. ২১৫-২৫১

১৮. বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্য ও গদ্য', *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৮-১৫০

১৯. বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)', *আধুনিক বাংলা কবিতা*, কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩, পৃ. ২৩-২৫

২০. বুদ্ধদেব বসু, *তিথিডোর*, কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ২৫, ১০৭

২১. আবু সয়ীদ আইয়ুব, 'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান', *পান্থজনের সখা*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ৩৩

২২. অমিয় চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রগীতির অন্তরা', *রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা*, সম্পাদনা : সুব্রত রুদ্র, কলকাতা : আশা প্রকাশনী, ১৯৭৯, পৃ. ৩৩-৩৫

২৩. শঙ্খ ঘোষ, 'ভূমিকা', *এ আমির আবরণ, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ* (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৯৩

২৪ রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থের তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য :
পপি বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রসংগীত সমালোচনার ইতিহাস*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১০, পৃ. ৩১৭-৩৮০

২৫. বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প', *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৬

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ', *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ. ২২

২৭. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড : গান, কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৭, পৃ. ৫১

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ', *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ. ২২

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীত ও ভাব' (পূর্বপাঠ : ১৮৮১), *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ. ২৬৫-২৭৩

ভারতী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮-তে ছাপা হয় 'সঙ্গীত ও ভাব' এবং ওই পত্রিকাতেই আষাঢ় ১২৮৮-তে 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'। পরে পরিণত বয়সে দুটিকে কেটেছেঁটে এবং জুড়ে 'সংগীত ও ভাব'-কে তার বর্তমান রূপটি দান করেন রবীন্দ্রনাথ। দ্রষ্টব্য :
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীত ও ভাব', *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ. ১-১৪

লক্ষণীয় : *ভারতী* আষাঢ় ১২৮৮-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'-র প্রথম অনুচ্ছেদ (পরে বর্জিত) থেকে পরিষ্কার, ১৮৮১-র 'সঙ্গীত ও ভাব' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ Herbert Spenser-এর The Origin and Foundation of Music' সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না।

দ্রষ্টব্য ·
'*ভারতী*-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ-কৃত পরিবর্তন' (আলোকচিত্র), *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা · বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ ৮

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ', *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ. ২২
৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীত', *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ. ৩১
৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সোনার কাঠি', *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ. ৩৯
৩৩. তদেব, পৃ ৪০
৩৪. সমীর সেনগুপ্ত, 'প্রতিভাসুন্দরী দেবী (ঠাকুর) চৌধুরী', *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, পৃ. ১৬০
৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবন-স্মৃতি*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (সুলভ সংস্করণ : নবম খণ্ড), কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ. ৪৮৩
৩৬. সিদ্ধার্থ ঘোষ, রেকর্ডে *রবীন্দ্রসংগীত*, কলিকাতা : ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪-৩৭
৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীত', *সংগীতচিন্তা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১, পৃ ৩৮
৩৮. সিদ্ধার্থ ঘোষ, *রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত*, কলিকাতা : ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন, ১৯৮৯, পৃ. ৬৯-৭২
৩৯. তদেব, পৃ. ১৫
৪০. তদেব, পৃ. ১১, ৩৭-৬৪
৪১. তদেব, পৃ. ৩১

কৃতজ্ঞতা : সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, রোসিঙ্কা চৌধুরী, অমিত চৌধুরী